দৈনিক
ইত্তেফাক

10 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতি ও শিক্ষকদের বিবেক

সাহাবুল হক

সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অনেকের মধ্যে ক্লাস ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা, পরীক্ষার খাতা মাসের পর মাস আটকে রাখা, খাতা জমা না দিয়ে বিদেশে পাড়ি জমানো, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের চোখে ধাঁধা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কনসালটেন্সিতে নিয়োজিত থাকা, কোর্স ফাইনাল পরীক্ষার উত্তরপত্র হারিয়ে ফেলা, শিক্ষক রাজনীতিতে নিজেদের ব্যস্ত রাখাসহ শিক্ষা ছুটির নামে বছরের পর বছর বিদেশে কাটানোর বিভিন্ন সংবাদ আমরা পত্রিকার পাতায় পড়েছি। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪৭৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ৫শ' জন বিভিন্ন ধরনের কনসালটেন্সি, ৩৯৩ জন উচ্চ শিক্ষার নামে বিদেশে এবং ৪০ থেকে ৪৫ জন ডেপুটেশনে রয়েছেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য এটি মোটেই শুভকর নয়। দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৭টি। এরমধ্যে ১৯৭৩'র অধ্যাদেশ অনুযায়ী দেশের বড় চারটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিজস্ব আইনে চললেও অলিখিতভাবে ৭৩'র অধ্যাদেশের প্রভাব সেখানে বিদ্যমান। প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে আবার আলাদা কিছু রীতিমালা। ৭৩'র অধ্যাদেশ শিক্ষকদের অবাধ স্বাধীনতা দিলেও জবাবদিহিতার তেমন কোন ব্যবস্থা এতে রাখা হয়নি। অধ্যাদেশ প্রণয়নের সময় শিক্ষকদের বিবেক এবং দায়িত্বশীলতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষকরা সেই দায়িত্বশীলপূর্ণ আচরণ যথাযথভাবে প্রদর্শন করতে পারেননি। তাই এখন নতুন করে দাবী উঠেছে শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করার। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো ছাড়াও আমাদের দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করেছে।

এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ) শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু রয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সেখানে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয় তা হলো নিয়মিত ও সময়মতো ক্লাসে উপস্থিত হওয়া, ক্লাস লেকচার উপস্থাপনের ধরন ও গভীরতা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোর্স সমাপন, সময়মতো পরীক্ষা নেয়া প্রভৃতি। প্রতি সেমিস্টারেই শিক্ষক মূল্যায়ন হয়। শিক্ষক মূল্যায়নের কাজটি করেন ছাত্ররাই। মূল্যায়ন শেষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লিখিত বা মৌখিকভাবে এর ফলাফল জানিয়ে দেয়। ফলাফলের ভিত্তিতে ধন্যবাদ অথবা সংশোধনের সুযোগ দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে ফলাফল কয়েকবার নেতিবাচক হলে এবং পরিস্থিতির কোন উন্নতি না হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে চাকরিও হারাতে হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু হলে শিক্ষকরা নিজেদের প্রয়োজনেই নিয়ম-কানুন মেনে চলবেন এবং উচ্চ শিক্ষায় ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকই শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতির তীব্র বিরোধিতা করেন। তাদের যুক্তি হলো- এর মাধ্যমে শিক্ষকরা ছাত্রদের নিকট জিম্মি হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিবে এবং ছাত্রদের বেয়াল বুশীমতো শিক্ষকদের কথাবার্তা বলতে হবে। ছাত্রদের কটু করা কিংবা তিরস্কার করা যাবে না। ছাত্রদের মর্জির উপর শিক্ষকদের চলতে হবে। এককথায় শিক্ষকদের কোন স্বাধীনতাই থাকবে না। শিক্ষকতা পেশা তার স্বকীয়তা হারাবে। শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা বলতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জাতীয় প্রেসক্লাবের উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে বলেছিলেন তার কিছু না হোক অন্তত যে শিক্ষক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোর্স ফাইনাল পরীক্ষার খাতা জমা দেননি কিংবা ইনকোর্স টিউটোরিয়ালের নম্বর আটকে রেখেছেন তার নামটা বিভাগের নোটিস বোর্ডে টানিয়ে দিতে হবে। এতে কিছুটা হলেও ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে বলে তার বিশ্বাস। আমার মতে শুধু এটি নয় একই সাথে বিভাগের নোটিস বোর্ডে আরো টানিয়ে দিতে হবে কোন শিক্ষক যথাসময়ে খাতা জমা দিয়েছেন, কে দেননি, কার জন্য ফলাফল প্রকাশে দেরি হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট কোর্সে কে কয়টি ক্লাস নিয়েছেন প্রভৃতি। কারণ একজন শিক্ষকের দায় বিভাগের সকল শিক্ষক বহন করতে পারেন না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি নবীন শিক্ষকদের ক্লাস নিতে নিতে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা অপরদিকে অনেক শিক্ষক মাসের পর মাস সুনির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই ক্লাস নেন না। অনেক শিক্ষকের এ অবস্থা দেখে অনেক তরুণ শিক্ষককে হতাশ কণ্ঠে বলতে শুনেছি বেশী ক্লাস নিয়ে কি হবে? কি লাভ এতে? সিনিয়রদের এ অবস্থা দেখে সদ্যনিয়োগ পাওয়া জুনিয়র শিক্ষকরা ক্লাস না নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহ পায়। এখানেই পাবলিক এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তফাৎ।

সবশেষে বলা যায়, আমাদের এ সমাজে আমরা কেউই জবাবদিহিতার উর্ধ্বে নই। প্রত্যেককেই তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। শিক্ষকরাও এ সমাজের অংশ। তাদেরকেও জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। প্রয়োজনে চলমান আইন পরিমার্জন ও পরিবর্ধন এবং তাতে না হলে নতুন আইন তৈরি করতে হবে।

আরেকটি বিষয় এখানে আসছে তা হলো শিক্ষকদের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধতা। এটি অত্যন্ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শাস্তির ভয়ে হয়তো মানুষ আইন মান্য করে তবে আইন মানুষকে সবসময় সঠিকপথে পরিচালনা করতে পারে না। তাই এ ক্ষেত্রে বিবেকের প্রশ্নটিই বড় করে দেখা দেয়। আইন যতটুকু না শক্তিশালী তার চেয়ে বিবেক অনেক বেশিমাত্রায় শক্তিশালী। আইনের স্থান অনেক উর্ধ্বে তবে আইনই একমাত্র শেষ কথা নয়। আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষকদের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে আইন যতটুকু না ভূমিকা রাখবে তার চেয়ে অনেক বেশি ও কার্যকর ভূমিকা রাখবে তাদের বিবেক।

কোন লোভের বশবর্তী হয়ে শিক্ষকরা এ পেশায় আসেননি। বরং মহান পেশার কথা বিবেচনা করেই সকলেই এই পেশায় এসেছেন। অর্থ-বিত্ত যাদের কাছে অধিকমাত্রায় গুরুত্ব পায় না সেখানে বিবেকের দাপট অনেক বেশি বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখি। পরিশেষে দেশের অন্যতম বুদ্ধিজীবী প্রফেসর মোজাফফর আহমদের এ সংক্রান্ত একটি বক্তব্য দিয়ে আজকের লেখার ইতি টানতে চাই "বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচাতে হলে শিক্ষকদের মূল্যবোধ জাগ্রত করতেই হবে।" প্রত্যাশা শিক্ষকদের বিবেক জাগ্রত হোক।

লেখক : শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক।